স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

চিকাগো বক্তৃতা

স্বামী বিবেকানন্দ

BENGALIEBOOK.COM
2021

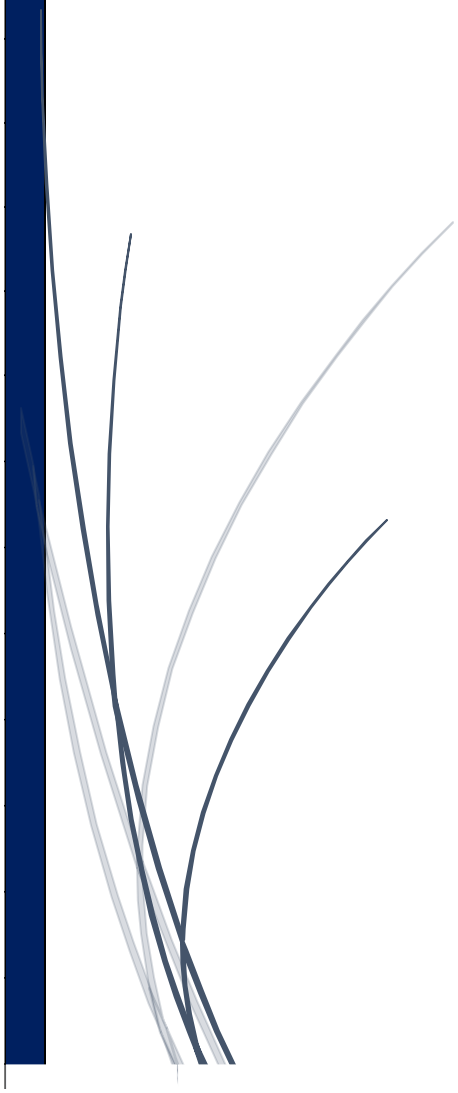

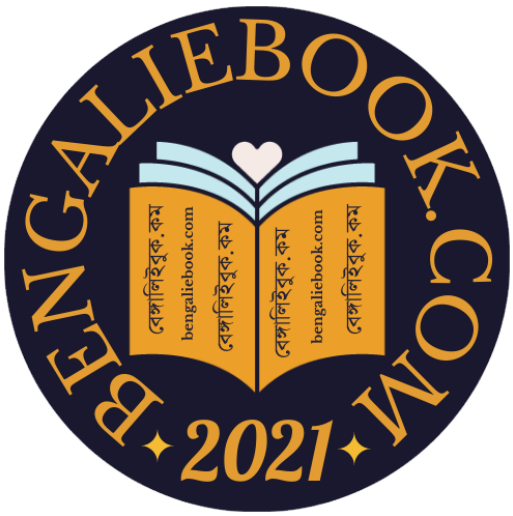

সূচিপত্র

১. ভূমিকা.....2
২. অভ্যর্থনার উত্তর.....8
৩. ভ্রাতৃভাব.....১১
৪. হিন্দুধর্ম.....১৩
৫. খ্রীষ্টানগণ ভারতের জন্য কি করিতে পারেন?.....৩০
৬. বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ.....৩২
৮. পরিশিষ্ট.....৩৫
৯. প্রাচ্য নারী.....৩৬
১০. ধর্মীয় ঐর্কের মহাসম্মেলন.....৩৭
১১. ভগবৎপ্রেম.....৩৮

১. ভূমিকা

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোতে সে বিশ্বমেলা ১ হইয়াছিল, ধর্ম-মহাসভা সেই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত একটি সন্মেলন। পাশ্চাত্যদেশে আজকাল যে সকল বিরাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী প্রায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেগুলির সহিত সাহিত্য-কলা-এবং বিজ্ঞান-সন্মেলন সংশ্লিষ্ট করাও একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বিষয়গুলি মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর, তাহাদের ইতিহাসে এইরূপ প্রত্যেকটি অধিবেশন যে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, তাহাও আশা করা যায়। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে মহা-সন্মেলনে একত্র-মিলিত মানবমণ্ডলী চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইনবিদ্যা, যন্ত্রবিজ্ঞান এবং জ্ঞানের অপরাপর শাখার তাত্ত্বিক গবেষণা ও কার্যকর আবিষ্কারের আদান-প্রদান প্রভৃতি বিষয়সকলের উন্নতি সাধনকেই তাঁহদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। মার্কিন সাহস ও মৌলিক মনোভাব লইয়া চিকাগোবাসিগণই ভাবিতে পারিয়াছিল যে, পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলির একত্র সমাবেশই হইবে এই-সকল সন্মেলনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্মেলন। এই-সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণের প্রত্যেকে নিজ ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে যে-সকল যুক্তি উপস্থাপিত করিবেন, আন্তরিক গভীর সহানুভূতি সহকারে তাহা শুনিতে হইবে-এরূপ সঙ্কল্পও করা হইয়াছিল। এইরূপ সমমর্যাদার ও সুনিয়ন্ত্রিত বাক্-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া প্রতিনিধিগণ যে সংসদ গঠন করিবেন, তাহা হইবে একটি ধর্ম-মহাসভা। ইহার ফলে ‘বিভিন্ন জাতির ধর্মগুলির মধ্যে ভ্রাতৃভাবপূর্ণ মিলনের প্রয়োজনীয়তা’ জগতের মানসপটে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইবে।

প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য যে নিমন্ত্রণ ও যথারীতি নির্বাচনের প্রয়োজন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়াই দক্ষিণভারতীয় অল্প কয়েকজন শিষ্য তাহাদের গুরুদেবকে বুঝাইতে তৎপর হইল যে, হিন্দুধর্মের পক্ষে বক্তৃতা দিবার জন্য এই সন্মেলনে তাঁহার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। অগাধ বিশ্বাসবশতঃ তাহাদের মানেই হয় নাই, তাহারা এমন কিছু দাবি করিতেছে, যাহা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাহারা ভাবিয়াছিল, বিবেকানন্দ সেখানে

উপস্থিত হইলেই বক্তৃতা দিবার সুযোগ পাইবেন। স্বামীজীও শিষ্যগণের মতোই জাগতিক রীতিনীতি ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। যখন তিনি নিশ্চিতভাবে জানিলেন যে, এই কার্যে তিনি ঈশ্বরাদেশ লাভ করিয়াছেন, তখন একাজে আর কোন বাধা থাকিতে পারে, স্বামীজী একথা ভাবিলেন না। যথারীতি বিজ্ঞপ্তি ও পরিচয়প্রত্রাদি ব্যতিরেকেই হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি জগতের সমৃদ্ধি ও শক্তির সুরক্ষিত দ্বারে প্রবেশ করিতে চলিলেন-এই ঘটনা অপেক্ষা হিন্দুধর্মের সংঘবদ্ধহীনতার বৈশিষ্ট্য আর অন্য কোন উপায়ে স্পষ্টতর হইতে পারিত না।

চিকাগোতে উপস্থিত হইয়া স্বামীজী অবশ্য প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। প্রেরিত ও গৃহিত আমন্ত্রণ অনুসারে কোন পরিচিত ও স্বীকৃত সংস্থা তাঁহাকে প্রেরণ করে নাই। অধিকন্তু প্রতিনিধি-সংখ্যা বাড়াইবার সময়ও উত্তীর্ণ, তালিকা পূর্বেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বস্টনে যদি কাহারও সহিত দৈবক্রমে পরিচয়ের কোন সুযোগ ঘটিয়া যায় এইরূপ ভাবিয়া কী গভীর নৈরাশ্য লইয়াই না তাঁহাকে চিকাগোর রুদ্ধদ্বার হইতে ফিরিতে হইয়াছিল!

এইভাবে দূরদৃষ্টি বা নিজের কোন পরিকল্পনা ছাড়াই তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের সহিত পরিচিত হইলেন। রাইট তাহার প্রতিভা উপলব্ধি কারিলেন এবং মাদ্রাজী শিষ্যগণের মতো তিনিও অনুভব করিলেন যে, আগামী ধর্ম-মহাসম্মেলনে জগৎকে এই ব্যক্তির বাণী শুনাইতে হইবে। পরে অধ্যাপক রাইট তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, ‘আপনার নিকট পরিচয়-পত্র দেখিতে চাওয়া আর সূর্যকে তাহার আলোকদানের কি অধিকার আছে, জিজ্ঞাসা করা একই কথা।’ এইরূপ প্রীতি ও প্রভাবেই স্বামীজীকে পুনরাই চিকাগোয় পাঠাইয়াছিল এবং সেখানে স্বীকৃত প্রতিনিধির মর্যাদা ও আসন লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। অধিবেশন আরম্ভ হইলে দেখা গেল তিনি বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত; সেখানে একমাত্র ভারতীয় বা একমাত্র বাঙালী না হইলেও তিনি ছিলেন যথার্থ হিন্দু ধর্মের একমাত্র প্রতিনিধি।

অন্যান্য সকলে কোন সমিতি, সমাজ, সম্প্রদায় বা ধর্মসংস্থার প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। একমাত্র স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল-হিন্দুদের আধ্যাত্মিক

ভাবধারা; সেদিন তাঁহারেই মাধ্যমে ঐ ভাবগুলির সর্বপ্রথম সংজ্ঞা ঐক্য ও রূপ লাভ করিয়াছিল। প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে নিজগুরুর মধ্যে এবং পরে ভারতে সর্বত্র ভ্রমণকালে যে ভারতীয় ধর্মকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এখানে তাহাই তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল।যে ভাবগগুলিতে সমগ্র ভারতের ঐক্য আছে, সেই ভাবগুলিই তিনি ব্যাক্ত করিয়াছিলেন, অনৈক্যের কথাগুলি তিনি বলেন নাই। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ধর্ম-মহাসম্মেলনে (বিভিন্ন ধর্ম-বিষয়ক) প্রবন্ধপাঠে সতেরো দিন সময় লাগিয়াছিল। ১৯শে(সেপ্টেম্বর) স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। কিন্তু যেদিন প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনাসূচক বক্তৃতা ও সেগুলির উত্তর প্রদত্ত হইল, সেই প্রথমদিন হইতেই স্বামীজী শ্রোতৃবর্গের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। অপরাহ্নর শেষদিকে তিনি অভ্যর্ধনার উত্তর দিলেন। যখন তিনি সরল ভারতীয় সম্বোধনে আমেরিকাবাসিগণকে ‘ভগিনী ও ভ্রাতা’ বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন, যখন সেই প্রাচ্য সন্ন্যাসী নারীকে প্রথম স্থান দিলেন এবং সমগ্র জগৎকে নিজ পরিবার বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন সেই মহাসম্মেলনে আনন্দের যে শিহরণ সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা তৎকালে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মুখে বহুবার আমি শুনিয়াছি। তাঁহারা বলেন,’আমাদের স্বজাতীয় কোন ব্যাক্তি এভবে সম্বোধন করার কথা ভাবিতে পারিল না!’ সেই মুহূর্ত হইতেই বোধ হয় তাঁহার নিশ্চিত সাফল্যের সূত্রপাত হইয়াছিল।

সম্মেলনের ব্যবস্থাপকগণ চঞ্চল শ্রোতৃবর্গকে কৌশলে শান্ত করিবার জন্য পরে অনেকবার বলিয়াছেন, তাঁহারা যদি ধৈর্য ধারণ করিয়া অপেক্ষা করেন, তাহা সর্বশেষে স্বামীজী একটি গল্প বলিবেন বা একটি বক্তৃতা দিবেন। এই ভাষণগুলির কিছু কিছু অংশ সুরক্ষিত হইয়া এই পুস্তকে অন্যান্য বক্তৃতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এই সম্মেলন এমন একটি যুগের সূচনা কারিয়াছে, যাহার মূল্য ও গুরুত্ব যতদিন যাইবে ততই গভীরত্বরভাবে উপলব্ধ হইবে। প্রতিনিধিদের সম্মেলন কেবল বাহ্য চাকচিক্য ও আড়ম্বরের দিক হইতে সভার প্রারম্ভে ও অবসানে এমন একটি দৃশ্য রচনা করিয়াছে, যাহা আমাদের সমসাময়িক কেহ আর কখনোও দেখিবে না। কোটি

কোটি মানুষের ধর্মমতের প্রতিনিধিগণ মঞ্চের উপর উপস্থিত ছিলেন। দৃশ্যটিকে যথাযথরূপে ফুটাইবার প্রচেষ্টায় আমরা রেভাঃ জন হেনরী ব্যারোজ কর্তৃক প্রদত্ত কার্যবিবরণীর প্রামাণ্য ইতিহাস হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ

‘নির্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্বেই প্রসাদটি প্রতিনিধি ও দর্শকে ভরিয়া উঠিল, এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত দেশ-বিদেশের চার হাজার উৎসুক শ্রোতৃবৃন্দে ‘কলম্বাস হল’ পূর্ণ হইল। বেলা দশটার সময় বহুজাতির উড্ডীয়মান পতাকার নীচে বিশাল জনতার উল্লাসধ্বনির মধ্যে বারোটি ধর্মের প্রতিনিধিগণ হাত ধরাধরি করিয়া বারান্দা দিয়া আগাইয়া আসিলেন।এই সময়ে মঞ্চটি ছবির মতো চিত্তাকর্ষক রূপ ধারণ করিল। কেন্দ্রস্থলে মার্কিন যুক্তরাষ্টের গির্জার প্রধান যাজক কার্ডিনাল গিবন্ স্ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া উচ্চাসনে সমাসীন; কলম্বাসের এই স্মৃতিবৎসরে যথাযোগ্য বলিয়া তিনিই প্রার্থনা দ্বারা সভার উদ্বোধন করিবেন।

‘তাঁহার উভয়পার্শ্ব উপবিষ্ট প্রাচ্য প্রতিনাধিগণের নানাবর্ণের পোশাক ঔজ্জ্বল্যে তাঁহার পোশাকের সমতুলই হইয়াছিল । এইসব ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মনিগামীদের মধ্যে উপবিষ্ট, মনোরম উজ্জ্বল রক্তিম পরিচ্ছদ-পরিহিত, তাম্রাভ মুখমণ্ডল, শীর্ষে হরিদ্রাবর্ণের বৃহৎ উষ্ণীষ-ভূষিত বোম্বাই-এর বাগ্মী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের দিকেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার পার্শ্বে পীত লোহিত ও শুভ্র পরিচ্ছদ ভূষিত ভারতের একেশ্বরবাদী সমিতি বা ব্রাহ্মসমাজের বি. বি. নাগরকর ও সিংহলের বৌদ্ধপন্ডিত ধর্মপাল বসিয়াছিলেন। ধর্মপাল চার কোটি সাত লক্ষ পঞ্চাশ হজার বৌদ্ধের অভিনন্দন বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহার কৃশ ক্ষুদ্র দেহটি ছিল শুভ্রবাসমন্ডিত, কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম ছিল স্কন্ধ-বিলম্বিত।

‘সেখানে মুসলমান, পারসী ও জৈন ধর্মযাজকগণও ছিলেন; বর্ণ বৈচিত্র ও গতিভঙ্গিমায় তাঁহারা প্রত্যেকেই ছবির মতো দেখাইতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ ধর্মের ব্যাখ্যা ও সমর্থনে তৎপর হইলেন।

সর্বাধিক জাঁকজমাকপূর্ণ দেখাইতেছিল ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্নবিশিষ্ট রেশমনির্মিত উজ্জ্বল মূল্যবান্ বেশভূষিত জাপান ও চীনের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গকে। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম, তাও-ধর্ম, কংফুছের মত ও শিন্টো-ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন। তাপসদের মতো কৃষ্ণবর্ণের বেশ পরিধান করিয়া প্রাচ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে বসিয়াছিলেন শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ভরতের একেশ্বরবাদীদের বা ব্রাহ্মসমাজের নেতা মজুমদার মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে আসিয়াছিলেন এবং স্বীয় বাগ্মিতা ও ইংরাজী ভাষার উপর অপূর্ব অধিকারের দ্বারা বিপুল সংখ্যক শ্রোতাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

'আর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তি একটি অদ্ভুত বক্রষষ্টিতে ভর করিয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি হইলেন জান্তের (Zante) গ্রীক ধর্মযাজক-তাঁহার শুভ্র শ্মশ্রুরাশি আবক্ষবিস্তৃত, মস্তকে অদ্ভুতদর্শন শিরোভূষণ, কটিদেশ হইতে একটি বৃহৎ রৌপ্যনির্মিত ক্রশ বিলম্বিত। এশিয়া মাইনর হইতে আগত রক্তিমগণ্ড দীর্ঘকেশ এক গ্রীক 'সন্ন্যাসী' তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া গর্ব করিয়া বলিতেছিলেন যে, তিনি কখনও শিরোভূষণ ব্যবহার করেন নাই বা নিজ আহার-বসস্থানের জন্য একটি কপর্দকও ব্যয় করেন নাই। 'আফ্রিকার মেথডিস্ট চার্চের ধর্মযাজক আর্নেট (Arnett) এবং আফ্রিকাদেশীয় এক যুবরাজের আবলুস কাঠের মতো কৃষ্ণবর্ণ অথচ উজ্জ্বল মুখমণ্ডল মানাইয়া গিয়াছিল সন্মিলিত মহিলাদের সুন্দর বেশভূষায়; সর্বপশ্চাতে ঘনকৃষ্ণ পটভূমিরূপে ছিল প্রোটেস্টান্ট প্রতিনিধি ও নিমন্ত্রত অতিথিবর্গের কৃষ্ণ পরিচ্ছদ।' (ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যাভূন্ডের রেভাঃ ওয়েস্টর ধর্মোপদেশ হইতে গৃহীত)

সর্বশেষ ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্বধর্মসন্মেলনের সহিত অশোকের বৌদ্ধসংগীতি কিংবা সম্রাট্ আকবরের ধর্মসভার তুলনা করিয়া ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে নিজমত সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ জাতির দুঃসাহসই এইরূপ বিশাল উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সমন্বিত কার্যসূচীর পরিকল্পনা করিতে পারিয়াছিল; নাগরিকগণের শক্তি-প্রাচুর্য এবং উৎসাহই এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার পথ আবিষ্কার করিয়াছিল। ধর্মসভার গঠনতন্ত্র ইহাকে হিন্দুধর্মের সর্বধর্মসমন্বয়কারী ভাবগুলি প্রচার করিবার উপযুক্ত একটি অসাধারণ ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উদ্ধত ও বর্জনশীল

প্রতিনিধেবর্গ সরল গণতান্ত্রিক সাম্য ও সৌজন্যের ভিত্তিতে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আর কখনও এরূপ বিরাট ভাবে এইজাতীয় অগ্নিপরীক্ষার সন্মুখীন হইবেন বলিয়া মনে হয় না। বহুকাল ধরিয়া চিকাগো ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন ইতিহাসে একক স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। এই অবস্থায় এবং এই পরিবেশেই হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য জগতের সন্মুখে সর্বপ্রথম নিজমত ব্যক্ত করিয়াছিল।

-নিবেদিতা

২. অভ্যর্থনার উত্তর

১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্ম-মহাসভার প্রথম দিবসের অধিবেশনে সভাপতি কার্ডিন্যল গিবন্স্ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পরিচয় করাইয়া দিলে অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামীজী বলেনঃ

হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ আপনারা আমাদিগকে যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিবার জন্য উঠিতে গিয়া আমর হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসি-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বধর্মের যিনি প্রসূতি-স্বরূপ, তাঁহার নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

এই সভামঞ্চে সেই কয়েকজন বক্তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, যাঁহারা প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, অতি দূরদেশবাসী জাতিসমূহের মধ্য হইতে যাঁহারা এখানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারাও বিভিন্ন দেশে পরধর্মসহিষ্ণুতার ভাব প্রচারের গৌরব দাবি করিতে পারেন। যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্বাধিক মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকেই সহ্য করিনা, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভষায় ইংরেজী ‘এক্সক্লুশন’ (ভবার্থঃ বহিষ্করণ, পরিবর্জন) শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, অমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গর্ব অনুভব করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অর্ন্তভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমি আপনাদের এ-কথা বলিতে গর্ব অনুভব করিতেছি যে, আমরাই ইহুদীদের খাঁটি বংশধরগণের অবশিষ্ট অংশকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি; যে বৎসর রোমানদের ভয়ংঙ্কর উৎপীড়নে তাহদের পবিত্র মন্দির বিধ্বস্ত হয়,

সেই বৎসরই তাহারা দক্ষিণভারতে আমাদের মধ্যে আশ্রয়লাভের জন্য আসিয়াছিল। জরথুষ্ট্রের অনুগামী মহান্ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্মাবলম্বিগণ আশ্রয় দান করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত যাহারা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, আমি তাঁহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কোটি কোটি নরনারী যে-স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন, যে স্তবটি আমি শৈশব হইতে আবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, তাহারই কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি আপনাদের নিকট বলিতেছিঃ 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।' ১

বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তাহারা সকলে যেমন এক সমুদ্রে তাহাদের জলরাশি ঢালিয়া মিলাইয়া দেয়, তেমনি হে ভগবান্, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল ও কুটিল নানা পথে যাহারা চলিয়াছে, তুমিই তাহাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

পৃথিবীতে এযাবৎ অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাসম্মেলন এই ধর্ম-মহাসভা গীতা-প্রচারিত সেই অপূর্ব মতেরেই সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছি, সেই বাণীই ঘোষণা করিতেছিঃ 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।'–যে যে-ভাব আশ্রয় করিয়া আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে অর্জুন মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেই চলিয়া থাকে।

সাম্পদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বরাবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই-সকল ভীষণ পিশাচগুলি যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত। তবে ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত; এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্ম-মহাসমিতির সন্মানার্থ আজ যে ঘন্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লিখনীমুখে অনুষ্ঠিত

সর্বপ্রকার নির্যাতন এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।

৩. ভ্রাতৃভাব

১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে ধর্ম-মহাসমিতির পঞ্চম দিবসের অধিবেশনে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ স্ব স্ব ধর্মের প্রাধান্য-প্রতিপাদনের জন্য বাগ্‌বিতন্ডায় নিযুক্ত হন; অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দ এই গল্পটি বলিয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দেন।

আমি আপনাদিগকে একটি ছোট গল্প বলিব। এইমাত্র যে সুবক্তা ভাষণ শেষ করিলেন, তাঁহার কথা আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন-'এস আমরা পরস্পরের নিন্দাবাদ হইতে বিরত হই'। মানুষে মানুষে সর্বদা একটা মতভেদ থাকিবে ভাবিয়া বক্তা-মহাশয় বড়ই দুঃখিত। তবে আমি আপনাদের একটি গল্প বলি, হইতো তাহাতেই বুঝা যাইবে-এই মতভেদের কারণ কি।

একটি ব্যাঙ একটি কুয়ার মধ্যে বাস করিত। সে বহুকাল সেইখানেই আছে। যদিও সেই কুয়াতেই তাহার জন্ম এবং সেইখানেই সে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি ব্যাঙটি আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র ছিল। অবশ্য তখন বর্তমান কালের ক্রমবিকাশবাদীরা কেহ ছিলেন না, তাই বলা যায় না, অন্ধকার কূপে চিরকাল বাস করায় ব্যাঙটি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিল কি না; আমরা কিন্তু গল্পের সুবিধার জন্য ধরিয়া লইব তাহার চোখ ছিল। আর সে প্রতিদিন এরূপ উৎসাহে কুয়ার জল কীট ও জীবাণু হইতে মুক্ত রাখিত যে, সেরূপ উৎসাহ আধুনিক কীটাণুতত্ত্ববিদ্‌গণেরও শ্লাঘার বিষয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সে দেহে কিছু স্থূল ও মসৃণ হইয়া উঠিল। একদিন ঘটনাক্রমে সমুদ্রতীরের একটি ব্যাঙ আসিয়া সেই কূপে পতিত হইল।

কূপমণ্ডূকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথা

থেকে আসা হচ্ছে?'

'সমুদ্র থেকে আসছি।'

‘সমুদ্র? সে কত বড়? তা কি আমার এই কুয়োর মতো বড়?’ এই বলিয়া কূপমণ্ডূক কূপের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে লাফ দিল।

তাহাতে সাগরের ব্যাঙ বলিল, ‘ওহে ভাই, তুমি এই ক্ষুদ্র কূপের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা করবে কি ক’রে?’ ইহা শুনিয়া কূপমণ্ডূক আর একবার লাফ দিয়া জিজ্ঞাসা কলিল, ‘তোমার সমুদ্র কি এত বড়?’

‘সমুদ্রের সঙ্গে কুয়োর তুলনা ক’রে তুমি কি মূর্খের মতো প্রলাপ ব’ কছ?’

ইহাতে কূপমণ্ডূক বলিল, ‘আমার কুয়োর মতো বড় কিছুই হ’তে পারে না, পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় আর কিছুই থকতে পারে না, এ নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী, অতএব একে তাড়িয়ে দাও।’

হে ভ্রাতৃগণ, এইরূপ সংকীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। আমি একজন হিন্দু - আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছি এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছি! খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমত্র জগৎ মনে করিতেছেন! মুসলমানও নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন! হে আমেরিকাবাসিগণ, আপনারা যে আমাদের ক্ষুদ্র জগৎগুলির বেড়া ভাঙিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ দিতে হইবে। আশা করি, ভবিষ্যতে ঈশ্বর আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য-সম্পাদনে সহায়তা করিবেন।

৪. হিন্দুধর্ম

১৯শে সেপ্টেম্বর, নবম দিবসের অধিবেশনে স্বামীজী এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

হিন্দু, জরথুষ্ট্রীয় ও ইহুদী -এই তিনটি ধর্মই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান কাল অবধি এই পৃথিবীতে প্রচলিত রহিয়াছে। এই ধর্মগুলির প্রত্যেকটিই প্রচন্ড আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি লুপ্ত না হইয়া এগুলি যে এখও জীবিত আছে, তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাদের মধ্যে মহতী শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু একদিকে যেমন ইহুদী-ধর্ম তৎপ্রসূত খ্রীষ্টধর্মকে আত্মসাৎ করিতে পারা তো দূরের কথা, নিজেই ঐ সর্বজয়ী ধর্ম দ্বারা স্বীয় জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছ, এবং অতি অল্পসংখ্যক পারসী মাত্র এখন মহান জরথুষ্টীয় ধর্মের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; অপরদিকে আবার ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে, মনে হইয়াছে যেন বেদোক্ত ধর্মের ভিত্তি পর্যন্ত নড়িয়া গেল; কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় সাগরসলিল যেমন কিছু পশ্চাৎপদ হইয়া সহস্রগুণ প্রবল বেগে সর্বগ্রাসী বন্যারূপে ফিরিয়া আসে, সেইরূপ ইহাদের জননীস্বরূপ বেদোক্ত ধর্মও প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া আলোড়নের অগ্রগতি শেষ হইলে ঐ সম্প্রদায়গুলিকে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজের বিরাট দেহ পুষ্ট করিয়াছে।

বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের যে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান হইতে নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত সবকিছুরই, এমন কি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ-এগুলিরও স্থান হিন্দুধর্মে আছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই সকল বহুধা বিভিন্ন ভাব কোন্ সাধারণ কেন্দ্রে সংহত হইয়াছে? কোন্ সাধারণ ভিত্তি আশ্রয় করিয়া এই আপাতবিরোধী ভাবগুলি অবস্থান করিতেছে? আমি এখন এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আপ্তবাক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বেদসমূহকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে অনাদি ও অনন্ত বলিলে এই শ্রোতৃনণ্ডলীর কাছে তাহা হাস্যকর বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু 'বেদ' শব্দদ্বারা কোন পুস্তক-বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেই-সকলের সঞ্চিত ভান্ডারস্বরূপ। আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মনুষ্য-সমাজ ভুলিয়া গেলেও যেমন ঐগুলি বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতাস্বরূপ পরমাত্মার যে দিবা সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিস্মৃত হইয়া গেলেও এগুলি থাকিবে।

এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কারকগণের নাম 'ঋষি'। আমরা তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বা পূর্ণ বলিয়া ভক্তি ও মান্য করি। আমি এই শ্রোতৃমন্ডলীকে অতি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, অতিশয় উন্নত ঋষিদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন।

এ-স্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, উক্তআধ্যাত্মিক নিয়মাবলী নিয়মরূপে অনন্ত হইতে পারে, কিন্তু অবশ্যই তাহাদের আদি আছে। বেদ বলেন -সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদা সমপরিমান। আচ্ছা, যদি এমন এক সময়ের কল্পনা করা যায়, যখন কিছুই ছিল না, তবে এই সকল ব্যক্ত শক্তি তখন ছিল কোথায়? কেহ বলিবেন যে এগুলি অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরেই ছিল। তাহা হইলে বলিতে হয়-ঈশ্বর কখনও সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয়, কখনও সক্রিয় বা গতিশীল; অর্থাৎ তিনি বিকারশীল! বিকারশীল পদার্থমাত্রই মিশ্র পদার্থ এবং মিশ্র-পদার্থমাত্রই ধ্বংস-নামক পরিবর্তনের অধীন। তাহা হইলে ঈশ্বরেরও মৃত্যু হইবে; কিন্তু তাহা অসম্ভব। সুতরাং এমন সময় কখনও ছিল না, যখন সৃষ্টি ছিল না; কাজেই সৃষ্টি অনাদি।

কোন উপমা দ্বারা বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় -সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুইটি অনাদি ও অনন্ত সমান্তরাল রেখা। ঈশ্বর শক্তিস্বরূপ-নিত্যসক্রিয় বিধাতা; তাঁহারই নির্দেশে বিশৃঙ্খল

প্রলয়াবস্থা হইতে একটির পর একটির পর একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ জগৎ সৃষ্ট হইতেছে, কিছুকাল চালিত হইতেছে, পুনরায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। হিন্দুবালক গুরুর সহিত প্রতিদিন আবৃত্তি করিয়া থাকেঃ 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।'-অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব-পূর্ব কল্পের সূর্য ও চন্দ্রের মতো এই সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসন্মত।

আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার সত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করিবার চেষ্টা করি-'আমি' 'আমি' 'আমি',তাহা হইলে আমার মনে কি ভাবের উদয় হয়? এই দেহই আমি-এই ভাবই মনে আসে। তবে কি আমি জড়ের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নই? বেদ বলিতেছেন : না, আমি এই দেহ নই। দেহ মরিবে,কিন্তু আমি মরিব না। আমি এই দেহের মধ্যে আছি, কিন্তু যখন এই দেহ মরিয়া যাইবে তখনও আমি বাঁচিয়া থাকিব এবং এই দেহের জন্মের পূর্বেও আমি ছিলাম। আত্মা শূন্য হইতে সৃষ্ট নয়, কারণ 'সৃষ্টি' শব্দের অর্থ বিভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ; ভবিষ্যতে এগুলি নিশ্চয়ই আবার বিচ্ছিন্ন হইবে। অতএব আত্মা যদি সৃষ্ট পদার্থ হন, তাহা হইলে তিনি মরণশীলও বটে। সুতরাং আত্মা সৃষ্ট পদার্থ নন।

কেহ জন্মিয়া অবধি সুখভোগ করিতেছে- শরীর সুস্থ ও সুন্দর, মন উৎসাহপূর্ণ, কিছুরই অভাব নাই; আবার কেহ জন্মিয়া অবধি দুঃখভোগ করিতেছে-কাহারও হস্ত-পদ নাই, কেহ বা জড়বুদ্ধি এবং অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতেছে।

যখন সকলেই এক ন্যায়পরায়নণ ও করুণাময় ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট, তখন কেহ সুখী এবং কেহ দুঃখী হইল কেন? ভগবান কেন এত পক্ষপাতী? যদি বলো যে, যাহারা এজন্মে দুঃখভোগ করিতেছে, পরজন্মে তাহারা সুখী হইবে, তাহাতে অবস্থার কিছু উন্নতি হইল না। দয়াময় ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের রাজ্যে একজনও কেন দুঃখভোগ করিবে? দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে এভাবে দেখিলে এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর সৃষ্টির অন্তর্গত অসঙ্গতির কোন কারণ প্রদর্শন করার চেষ্টাও লক্ষিত হয় না; পরন্তু এক সর্বশক্তিমান্ স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নিষ্ঠুর আদেশেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। স্পষ্টতই ইহা অবৈজ্ঞানিক। অতএব স্বীকার

করিতে হইবে সুখী বা দুঃখী হইয়া জন্মিবার পূর্বে নিশ্চয় বহুবিধ কারণ ছিল, যাহার ফলে জন্মের পর মানুষ সুখী বা দুঃখী হয়; তাহার নিজের পূর্বজন্মের কর্মসমূহই সেই-সব কারণ।

দেহ-মনের প্রবণতা মাতাপিতার দেহ-মনের প্রবণতা হইতেই উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ হয় না কি? দেখা যাইতেছে যে, দুইটি সত্ত্বা সমান্তরাল রেখায় বর্তমান-একটি মন, অপরটি স্থূল পদার্থ। যদি জড় ও জড়ের বিকার দ্বারাই আমাদের অন্তর্নিহিত সকল ভাব যথেষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়, তবে আর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। কিন্ত জড় হইতে চিন্তা উদ্ভূত হইয়াছে-ইহা প্রমাণ করা যায় না, এবং যদি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে একত্ববাদ অপরিহার্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক একাত্ববাদ নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত এবং জড়বাদী একাত্ববাদ অপেক্ষা ইহা কম বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এ দুইটির কোনটিরই প্রয়োজন নাই।

আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, শরীরমাত্রেই উত্তরাধিকারসূত্রে কতকগুলি প্রবণতা লাভ করে, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ দৈহিক। এই দৈহিক প্রবণতার মাধ্যমেই মনের বিশেষ প্রবণতা ব্যক্ত হয়। মনের এরূপ বিশেষ প্রবণতার কারণ পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম। বিশেষ কনো প্রবণতাসম্পন্ন জীব সদৃশবস্তুর প্রতি আকর্ষণের নিয়মানুসারে এমন এক শরীরে জন্মগ্রহণ করিবে, যাহা তাহার ঐ প্রবণতা বিকশিত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় হয়। ইহা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-সম্মত, কারণ বিজ্ঞান অভ্যাস দ্বারা সব কিছু ব্যাখ্যা করিতে চায়, অভ্যাস আবার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানের ফল। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, নবজাত প্রাণীর স্বভাবও তাহার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত কর্মের ফল; এবং যেহেতু তাহার পক্ষে বর্তমান জীবনে ঐগুলি লাভ করা অসম্ভব, অতএব অবশ্যই পূর্ব জীবন হইতেই ঐতুলি আসিয়াছে।

আর একটি প্রশ্নের ইঙ্গিত আছে। স্বীকার করা গেল পূর্বজন্ম আছে, কিন্তু পূর্ব জীবনের বিষয় আমাদের মনে থাকে না কেন? ইহা সহজেই বুঝানো যাইতে পারে। আমি এখন ইংরাজীতে কথা বলিতেছি, ইহা আমার মাতৃভাষা নয়। বাস্তবিক এখন আমার চেতন-মনে মাতৃভাষার একটি অক্ষরও নাই। কিন্তু যদি আমি মনে করিতে চেষ্টা করি, তাহা

হইলে উহা এখনই প্রবল বেগে মনে উঠিবে। এই ব্যাপারে বুঝা যাইতেছে, মনঃসমুদ্রের উপরিভাগেই চেতন-ভাব অনুভূত হয় এবং আমাদের পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা সেই সমুদ্রের গভীরদেশে সঞ্চিত থাকে।

চেষ্টা ও সাধনা কর, ঐগুলি সব উপরে উঠিয়া আসিবে, এমন কি পূর্বজন্ম সম্বন্ধেও তুমি জানিতে পারিবে।

পূর্বজন্ম সম্বন্ধে ইহাই সাক্ষাৎ ও পরীক্ষামূলক প্রমাণ। কার্যক্ষেত্রে সত্যতা নির্ণীত হইলেই কোন মতবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়, এবং ঋষিগণ সমগ্র জগতে সদর্পে ঘোষণা করিতেছেন : স্মৃতিসাগরের গভীরতম প্রদেশ কিরূপে অলোড়িত করিতে হয়, সেই রহস্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। সাধনা কর, তোমরাও পূর্বজন্মের সকল কথা মনে করিতে পারিবে।

অতএব দেখা গেল, হিন্দু নিজেকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করে। 'সেই আত্মাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না।'১ হিন্দু বিশ্বাস করে : সেই আত্মা এমন একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি কোথাও নাই, কিন্তু যাহার কেন্দ্র দেহমধ্যে অবস্থিত, এবং সেই কেন্দ্রের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু। আর আত্মা জড়নিয়মের বশীভূত নন, আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। কিন্তু কোন কারণবশতঃ জড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন ও নিজেকে জড় মনে করিতেছেন।

পরবর্তী প্রশ্ন : কেন এই শুদ্ধ পূর্ণ ও মুক্ত আত্মা জড়ের দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ? পূর্ণ হইয়াও কেন তিনি নিজেকে অপূর্ণের ন্যায় মনে করিতেছেন? শুনিয়াছি, কেহ কেহ মনে করেন- এই প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করিতে পারিবেন না বলিয়া হিন্দুগণ উহা এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করেন। কোন কোন পন্ডিত আত্মা ও জীব-এই দুয়ের মধ্যে কতকগুলি পূর্ণকল্প সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চান এবং শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে বহুবিধ সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ব্যবহার করেন। কিন্তু সংজ্ঞা দিলেই ব্যাখ্যা করা হয় না।

প্রশ্ন যেমন তেমনি রহিল। যিনি পূর্ণ, তিনি কেমন করিয়া পূর্ণকল্প হইতে পারেন? যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, কেমন করিয়া তাঁহার সেই স্বভাবের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হয়? হিন্দুগণ এ সম্বন্ধে সরল ও সত্যবাদী। তাঁহারা মিথ্যা তর্কযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাঁহারা সাহসের সহিত এই প্রশ্নের সন্মুখীন হন এবং উত্তরে বলেন, 'জানি না, কেমন করিয়া পূর্ণ আত্মা নিজেকে অপূর্ণ এবং জড়ের সহিত যুক্ত ও জড়ের নিয়মাধীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্যাপারটি তো অনুভূত সত্য। প্রত্যকেই তো নিজিকে দেহ বলিয়া মনে করে।' কেন এরূপ হইল, কেনই বা আত্মা এই দেহে রহিয়াছেন, এ তত্ত্ব তাঁহারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন না। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা-এরূপ বলিলে কিছুই ব্যাখ্যা করা হইল না। হিন্দুরা যে বলেন, 'আমরা জানি না', তাহা অপেক্ষা এই উত্তর আর বেশী কিছু নয়।

১ গীতা, ২। ২৩

বেশ, তাহা হইলে বুঝা গেল যে,মানুষের আত্মা অনাদি অমর পূর্ণ ও অনন্ত এবং কেন্দ্র-পরিবর্তন বা দেহ হইতে দেহন্তরে গমনের নামই মৃত্যু।বর্তমান অবস্থা পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা, এবং ভবিষ্যৎ বর্তমান কর্ম দ্বারা নিরূপিত হয়। আত্মা জন্ম হইতে জন্মের পথে-মৃত্যু হইতে মৃত্যুর দিকে কখন বিকশিত হইয়া, কখন সঙ্কুচিত হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠে : প্রচন্ড বায়ুমুখে ক্ষুদ্র তরণী যেমন একবার ফেনময় তরঙ্গের শীর্ষে উঠিতেছে, পরক্ষণেই মুখব্যাদানকারী তরঙ্গ-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মাও কি সদসৎ কর্মের একান্ত বশবর্তী হইয়া ক্রমাগত একবার উঠিতেছে ও একবার পড়িতেছে? আত্মা কি নিত্যপ্রবাহিত প্রচন্ড গর্জনশীল অদম্য কার্যকারণ-স্রোতে দুর্বল অসহায় অবস্থায় ক্রমাগত ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতেছে? আত্মা কি একটি ক্ষুদ্র কীটের মতো কার্যকারণ চক্রের নিম্নে স্থাপিত? আর ঐ চক্র সন্মুখে যাহা পাইতেছে, তাহাই চূর্ণ করিয়া ক্রমাগত বিঘূর্ণিত হইতেছে-বিধবার অশ্রুর দিকে চাহিতেছে না, পিতামাতৃহীন বালকের ক্রন্দনও শুনিতেছে না?

ইহা ভাবিলে মন দমিয়া যায়, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মই এই। তবে কি কোন আশা নাই? পরিত্রাণের কি কোন পথ নাই? মানবের হতাশ হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এইরূপ ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল, করুণাময়ের সিংহাসন সমীপে উহা উপনীত হইল, সেখান হইতে আশা ও সান্ত্বনার বাণী নামিয়া আসিয়া এক বৈদিক ঋষির হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিল। বিশ্বসমক্ষে দন্ডায়মান হইয়া ঋষি তারস্বরে জগতে এই আনন্দ সমাচার ঘোষণা করিলেন, 'শোন, শোন অমৃতের পুত্রগণ, শোন দিব্যালোকের অধিবাসিগণ, আমি সেই পুরাতন মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। আদত্যের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, তিনি সকল অজ্ঞান-অন্ধকারের পারে; তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, আর অন্য পথ নাই।' ১

'অমৃতের পুত্র'-কি মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চান না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী-পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্য-ভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হইয়া তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করিতেছ, ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা-চির-আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও, জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।

এইরূপে বেদ ঘোষণা করিতেছেন- কতকগুলি ক্ষমাহীন নিয়মাবলীর ভয়াবহ সমাবেশ নয় বা কার্য-কারণের কারাবন্ধন আমাদের নিয়ন্তা নয়; কিন্তু এই-সকল নিয়মের ঊর্ধ্বে প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে এক বিরাট পুরুষ অনুস্যূত রহিয়াছেন,

১ শ্বেতাশ্ব উপ, ২। ৫

যাঁহার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু জগতে পরিভ্রমণ করিতেছে।' ১

তাঁহার স্বরূপ কি? তিনি সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান্-সকলের উপরেই তাঁহার করুণা। 'তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদের পরম প্রেমাস্পদ সখা বন্ধু, তুমি সমস্ত শক্তির মূল, তুমি আমাদের শক্তি দাও, তুমি বিশ্বজগতের ভার ধারণ করিয়া আছ; এই ক্ষুদ্র জীবনের ভার বহন করিতে আমায় সাহায্য কর'-বৈদিক ঋষিগন এইরূপ গানই গাহিয়াছেনল। আমরা কিভাবে তাঁহাকে পূজা করিব?-প্রীতি ভালবাসা দিয়া। প্রেমাস্পদরূপে-ঐহিক ও পারত্রিক সমুদয় প্রিয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তররূপে তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে।

শুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে বেদ এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। এখন দেখা যাক্ হিন্দুগণ পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া যাঁহাকে বিশ্বাস করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এই প্রেমতত্ত্ব পরিপূর্ণ করিযা প্রচার করিয়াছেন।

তিনি শিক্ষা দিয়াছেন : মানুষ পদ্মপত্রের মতো সংসারে বাস করিবে। পদ্মপত্র জলে থাকে, কিন্তু তাহাতে জল লাগে না; মানুষ তেমনি এই সংসারে থাকিবে, ঈশ্বরে হৃদয সমর্পণ করিয়া হাতে কাজ করিবে।

ইহলোকে ও পরলোকে পুরস্কারের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ভালোবাসা ভাল; কিন্তু ভালোবাসার জন্যই তাঁহাকে ভালবাসা আরও ভাল। তাইতো এই প্রার্থনা : প্রভু! আমি তোমার নিকট ধন, সন্তান বা বিদ্যা চাই না। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি শত বিপদের মধ্য দিয়া যাইব; কিন্তু আমার শুধু এই ইচ্ছা পূর্ণ করিও, কোন পুরস্কারের আশায় নয়, নিঃস্বার্থভাবে শুধু ভালবাসার জন্যই যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণের এক শিষ্য তৎকালীন ভারতের সম্রাট্ শত্রু কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া রানীর সহিত হিমালয়ের অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে রানী একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ব্যক্তি, আপনাকে কেন এত কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে?' যুধিষ্ঠির উত্তর দেন, 'প্রিয়ে, দেখ দেখ, হিমালয়ের দিকে চাহিয়া দেখ, আহা! কেমন সুন্দর ও মহান্! আমি হিমালয় বড় ভালবাসি। পর্বত আমাকে কিছুই দেয় না,

তথাপি সুন্দর ও মহান্ বস্তুকে ভালবাসাই আমার স্বভাব, তাই আমি হিমালয়কে ভালবাসি। ঈশ্বরকেও আমি ঠিক এই জন্য ভালবাসি। তিনি নিখিল সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের মূল, তিনিই ভালবাসার একমাত্র পাত্র। তাঁহাকে ভালবাসা আমার স্বভাব, তাই আমি ভালবাসি। আমি কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করি না, আমি তাঁহার নিকট কিছুই চাই না, তাঁহার যেখানে ইচ্ছা আমাকে তিনি সেখানে রাখুন, সর্ব অবস্থাতেই আমি তাঁহাকে ভালবাসিব। আমি ভালবাসার জন্য তাঁহাকে ভালবাসি। আমি ভালবাসার ব্যবসা করি না।'

১ কঠ উপ, ২।৩।৩

বেদ শিক্ষা দেন : আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ, কেবল জড় পঞ্চভূতে বদ্ধ হইয়া আছেন; এই বন্ধনের শৃঙ্খল চূর্ণ হইলেই আত্মা পূর্ণত্ব উপলব্ধি করেন। অতএব এই পরিত্রাণের অবস্থা বুঝাইবার জন্য ঋষিদের ব্যবহৃত শব্দ 'মুক্তি'! মুক্তি, মুক্তি-অপূর্ণতা হইতে মুক্তি-মৃত্যু ও দুঃখ হইতে মুক্তি।

ঈশ্বরের কৃপা হইলেই এই বন্ধন ঘুচিয়া যাইতে পারে এবং পবিত্র-হৃদয় মানুষের উপরই তাঁহার কৃপা হয়। অতএব পবিত্রতাই তাঁহার কৃপালাভের উপায়। কিভাবে তাঁহার করুণা কাজ করে? শুদ্ধ বা পবিত্র হৃদয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। নির্মল বিশুদ্ধ মানুষ ইহজীবনেই ঈশ্বরের দর্শনলাভ করেন। 'তখনই-কেবল তখনই হৃদয়ের সকল কুটিলতা সরল হইয়া যায়, সকল সন্দেহ বিদূরিত হয়।' মানুষ তখন আর ভয়ঙ্কর কার্যকারণ নিয়মের ক্রীড়াকন্দুক নয়। ইহাই হিন্দুধর্মের মর্মস্থল, ইহাই হিন্দুধর্মের প্রাণস্বরূপ। হিন্দু কেবল মতবাদ ও শাস্ত্রবিচার লইয়া থাকিতে চায় না; সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির পারে যদি অতীন্দ্রিয় সত্তা কিছু থাকে, হিন্দু সাক্ষাৎভাবে তাহার সন্মুখীন হইতে চায়। যদি তাহার মধ্যে আত্মা বলিয়া কিছু থাকে, যাহা আদৌ জড় নয়,-যদি করুণাময় বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা থাকেন, হিন্দু সোজা তাঁহার কাছে যাইবে, অবশ্যই তাঁহাকে দর্শন করিবে। তবেই তাহার সকল সন্দেহ দূর হইবে। অতএব আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ দিতে গিয়া জ্ঞানী হিন্দু বলেন, 'আমি আত্মাকে দর্শন করিয়াছি, ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছি।' সিদ্ধি বা

পূর্ণত্বের ইহাই একমাত্র নিদর্শন। কোন মতবাদ অথবা বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাস করার চেষ্টাতেই হিন্দুধর্ম নিহিত নয়; অপরোক্ষানুভূতিই উহার মূলমন্ত্র, শুধু বিশ্বাস করা নয়, আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়াই-উহা জীবনে পরিণত করাই ধর্ম।

এখন দেখা যাইতেছে, ক্রমাগত সংগ্রাম ও সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা-দিব্যভাবে ভাবান্বিত হইয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়া ও তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া সেই 'স্বর্গস্থ পিতা'র মতো পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম।

পূর্ণ হইলে মানুষের কি অবস্থা হয়? তিনি অনন্ত আনন্দময় জীবন যাপন করেন। আনন্দের একমাত্র উৎস ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তিনি পরমানন্দের অধিকারী হন, এবং ঈশ্বরের সহিত সেই আনন্দ উপভোগ করেন-সকল হিন্দু এ-বিষয়ে একমত। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের ইহা সাধারণ ধর্ম।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে, পূর্ণতাই পরম তত্ত্ব, এবং সেই পরম কখনও দুই বা তিন হইতে পারে না, উহাতে কোন গুণ বা ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব যখন আত্মা এই পূর্ণ ও পরম অবস্থায় উপনীত হন ,তখন ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাইবেন এবং একমাত্র ব্রহ্মকেই নিত্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবেন। তিনিই আত্মার স্বরূপ-নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান, নিরপেক্ষ আনন্দ-সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ। আমরা প্রায়ই পড়িয়া থাকি, আত্মার এই অবস্থা-ব্যক্তিত্বের লয়-কাঠ পাথরের

মতো জড়াবস্থা; ইহাতে লেখকদের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়, কারণ যিনি কখনও আঘাতের বেদনা বোধ করেন নাই, তিনি অপরের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া পরিহাস করেন ।

আমি বলিতেছি, এই অবস্থা ঐরূপ কিছু নয়। এই ক্ষুদ্র দেহের চেতনা উপভোগ যদি সুখের হয়, তবে দুইটি দেহের চেতনা উপভোগ আরও বেশী সুখের হইবে। এইরূপে দেহসংখ্যা যতই বাড়িবে, আমার সুখও ততই বাড়িবে। এইরূপে যখন এই নিখিল বিশ্বে আমার আত্মবোধ হইবে, তখনই আমি আনন্দের পরাকাষ্ঠায়-লক্ষ্যে উপনীত হইব।

অতএব এই অনন্ত বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে গেলে এই দুঃখপূর্ণ ক্ষুদ্র দেহাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। যখন আমি প্রাণস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইব; যখন আনন্দস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব; যখন জ্ঞানস্বরূপ হইয়া যাইব, তখনই ভ্রমের নিবৃত্তি। ইহাই যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানের প্রমাণে জানিয়াছি-দেহগত ব্যক্তিত্ব ভ্রান্তিমাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমার শরীর এই নিরবচ্ছিন্ন জড়সমুদ্রে অবিরাম পরিবর্তিত হইতেছে; সুতরাং আমার চৈতন্যাংশ সম্বন্ধে এই অদ্বৈত (একত্ব)-জ্ঞানেই কেবল যক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয়; এবং যখনই কোন বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে উপনীত হয়, তখন উহার অগ্রগতি থামিয়া যাইবেই, কারণ ঐ বিজ্ঞান তাহার লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছে। যথা-রসায়নশাস্ত্র যদি এমন একটি মূল পদার্থ আবিষ্কার করে, যাহা হইতে অন্যান্য সকল পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে উহা চরম উন্নতি লাভ করিল। পদার্থবিদ্যা যদি এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করিতে পারে, অন্যান্য শক্তি যাহার রূপান্তর মাত্র, তাহা হইলে ঐ বিজ্ঞানের কার্য শেষ হইল। ধর্মবিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে,যখন তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়াছে, যিনি এই মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবণস্বরূপ, যিনি নিত্যপরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র অচল অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্র পরমাত্মা-অন্যান্য অত্মা যাঁহার ভ্রমাত্মক প্রকাশ। এইরূপে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়া শেষে অদ্বৈতবাদে উপনীত হইলে ধর্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই সর্বপ্রকার জ্ঞান বা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।

সকল বিজ্ঞানকেই অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ ‘সৃষ্টি না বলিয়া ‘বিকাশ’ শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। হিন্দু যুগ যুগ ধরিয়া যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নূতনতর আলোকে আরও জোরালো ভাষায় প্রচারিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে।

এখন দর্শনের উচ্চ শিখর হইতে অবরোহণ করিয়া অজ্ঞলোকদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করি। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, ভারতবর্ষে বহু-ঈশ্বরবাদ নাই। প্রতি

দেবালয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যদি কেহ শ্রবণ করে, তাহা হইলে শুনিতে পাইবে, পূজক দেববিগ্রহে ঈশ্বরের সমুদয় গুণ, এমন কি সর্বব্যাপিত্ব পর্যন্ত আরোপ করিতেছে। ইহা বহু-ঈশ্বরবাদ নয়, বা ইহাকে কোন দেব-বিশষের প্রাধান্যবাদ বলিলেও প্রকৃত ব্যাপার ব্যাখ্যাত হইবে না। গোলাপকে যে-কোন অন্য নামই দাও না কেন, তাহার সুগন্ধ সমানই থাকিবে। সংজ্ঞা বা নাম দিলেই ব্যাখ্যা করা হয় না।

মনে পড়ে বাল্যকালে একদা এক খ্রীষ্টান পাদ্রীকে ভারতে এক ভিড়ের মধ্যে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলাম। নানাবিধ মধুর কথা বলিতে বলিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি যদি তোমাদের বিগ্রহ-পুতুলকে এই লাঠি দ্বারা আঘাত করি, তবে উহা আমার কি করিতে পারে?' জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল, 'আমি যদি তোমার ভগবানকে গালাগালি দিই, তিনিই বা আমার কি করিতে পারেন?' পাদ্রী উত্তর দিলেন, 'মৃত্যুর পর তোমার শাস্তি হইবে।' সেই ব্যক্তিও বলিল, 'তুমি মরিলে পর আমার দেবতাও তোমাকে শাস্তি দিবেন।'

ফলেই বৃক্ষের পরিচয়। যখন দেখি যে যাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলা হয়, তাঁহাদের মধ্যে এমন সব মানুষ আছেন, যাঁহাদের মতো নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম কখনও কোথাও দেখি নাই, তখন মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় : পাপ হইতে কি কখনও পবিত্রতা জন্মিতে পারে?

কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্মান্ধতা আরও খারাপ। খ্রীষ্টানরা কেন গির্জায় যান? ক্রুশই বা এত পবিত্র কেন? প্রার্থনার সময় কেন আকাশের দিকে তাকানো হয়? ক্যাথলিকদের গির্জায় এত মূর্তি রহিয়াছে কেন? প্রোষ্টান্টেদের মনে প্রার্থনাকালে এত ভাবময় রূপের আর্বিভাব হয় কেন ? হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, নিঃশ্বাস গ্রহণ না করিয়া জীবনধারণ করা যেমন অসম্ভব, চিন্তাকালে মনোময় রূপ বিশেষের সাহায্য না লওয়াও

আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব। ভাবানুষঙ্গনিয়মানূসারে জড়মূর্তি দেখিলে মানসিক ভাববিশেষের উদ্দীপন হয়, বিপরীতক্রমে মনে ভাববিশেষের উদ্দীপন হইলে তদনুরূপ মূর্তিবিশেষও মনে উদিত হয়। এইজন্য হিন্দু উপাসনার সময়ে বাহ্য প্রতীক ব্যবহার করে। সে বলিবে, তাহার উপাস্য দেবতায় মন স্থির করিতে প্রতীক সাহায্য করে। সে তোমাদেরই মতো জানে, প্রতিমা ঈশ্বর নয়, সর্বব্যাপী নয়। আচ্ছা বলতো, ‘ সর্বব্যাপী’ বলিতে অধিকাংশ মানুষ-প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবীর মানুষ কি বুঝিয়া থাকে? ইহা একটি শব্দমাত্র-একটি প্রতীক। ঈশ্বরের কি বিস্তৃতি আছে? তা যদি থাকে, তবে ‘সর্বব্যাপী’ শব্দটি আবৃত্তি করিলে আমাদের মনে বড়জোর বিস্তৃত আকাশ অথবা মহাশূন্যের কথাই উদিত হয়, এই পর্যন্ত।

দেখা যাইতেছে-যেভাবেই হউক-মানুষের মনের গঠনানুসারে অনন্তের ধারণা অনন্ত নীলাকাশ বা সমুদ্রের প্রতিচ্ছবির সহিত জড়িত; সেজন্য আমরা স্বভাবতই পবিত্রতার ধারণা গির্জা, মসজিদ বা ক্রুশের সহিত যুক্ত করিয়া থাকি। হিন্দুরা পবিত্রতা, সত্য, সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি বিভিন্ন মূর্তি ও প্রতীকের সহিত যুক্ত

করিয়া রাখিয়াছেন। তবে প্রভেদ এই যে, কেহ কেহ সমগ্র জীবন স্বীয় ধর্মসম্প্রদায়ের গন্ডিবদ্ধ ভাবের মধ্যেই নিষ্ঠাপূর্বক কাটাইয়া দেন, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লাভ করেন না, তাঁহাদের নিকট কয়েকটি মতে সন্মতি দেওয়া এবং লোকের উপকার করা ভিন্ন ধর্ম আর কিছুই নয়; কিন্তু হিন্দুর সমগ্র ধর্মভাব অপরোক্ষানুভূতিতেই কেন্দ্রীভূত। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মানুষকে দেবতা হইতে হইবে। মন্দির, প্রার্থনাগৃহ, দেববিগ্রহ বা ধর্মশাস্ত্র-সবই মানুষের ধর্মজীবনের প্রাথমিক অবলম্বন ও সহায়ক মাত্র, তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে।

শাস্ত্র বলিতেছেন : ‘বাহ্যপূজা-মূর্তিপূজা প্রথমাবস্থা; কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে মানসিক প্রার্থনা পরবর্তী স্তর; কিন্তু ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই উচ্চতম অবস্থা।’১ যে একাগ্র সাধক জানু পাতিয়া দেববিগ্রহের সন্মুখে পূজা করেন, লক্ষ্য কর-তিনি তোমাকে কি বলেন, ‘সূর্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; চন্দ্র তারা এবং এই বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে

না;এই অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে ? ইহারা সকলেই তাঁহার আলোকে প্রকাশিত।'২ তিনি কাহারও দেববিগ্রহকে গালি দেন না বা প্রতিমাপূজাকে পাপ বলেন না। তিনি ইহাকে জীবনের এক প্রয়োজনীয় অবস্থা বলিয়া স্বীকার করেন। শিশুর মধ্যেই পূর্ণ মানবের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। বৃদ্ধের পক্ষে শৈশব ও যৌবনকে পাপ বলা কি উচিত হইবে?

হিন্দুধর্মে বিগ্রহ-পূজা যে সকলের অবশ্য কর্তব্য, তাহা নয়। কিন্তু কেহ যদি বিগ্রহের সাহায্যে সহজে নিজের দিব্য ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে কি উহাকে পাপ বলা সঙ্গত? সাধক যখন ঐ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, তখনও তাঁহার পক্ষে উহাকে ভুল বলা সঙ্গত নয়। হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য হইতে সত্যে-নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হইতেছে। হিন্দুর নিকট নিম্নতম জড়োপাসনা হইতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সাধনার অর্থ অসীমকে ধরিবার-উপলব্ধি করিবার জন্য মানবাত্মার বিবিধ চেষ্টা। জন্ম, সঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী প্রত্যেকের সাধন-প্রচেষ্টা নিরূপিত হয়। প্রত্যেকটি সাধনই ক্রমোন্নতির অবস্থা। প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল-পক্ষীর শাবকের মতো ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিত থাকে, এবং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া শেষে সেই মহান্ সূর্যে উপনীত হয়।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, হিন্দুগণ এই রহস্য ধরিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সন্মুখে তাহারা একমাপের জামা রাখিয়া দেয়; জ্যাক, জন, হেনরি প্রভৃতি সকলকেই ঐ এক মাপের জামা পরিতে হইবে। যদি জন বা হেনরির গায়ে না লাগে, তবে তাহাকে জামা না পরিয়া খালি গায়েই থাকিতে

১ মহানির্বাণতন্ত, ৪। ১২
২ কঠ, উপ, ২।২।১৫; শ্বেঃ,৬।১৪;মু, ২। ২। ১০

হইবে। হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছেনঃ আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরম তত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব; এবং প্রতিমা ক্রুশ বা চন্দ্রকলা প্রতীকমাত্র, আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিবার অবলম্বনস্বরূপ। এই প্রকার সাহায্য যে সকলের পক্ষেই আবশ্যক তাহা নয়, তবে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই প্রকার সাহায্য আবশ্যক। যাহাদের পক্ষে ইহা আবশ্যক নয়, তাহাদের বলিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই যে, ইহা অন্যায়।

আর একটি বিষয় বলা আমার অবশ্য কর্তব্য। ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা বলিলে ভয়াবহ একটা কিছু বুঝায় না। ইহা দুষ্কর্মের প্রসূতি নয়, বরং ইহা অপরিণত মন কর্তৃক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ধারণা করিবার চেষ্টাস্বরূপ। হিন্দুদেরও অনেক দোষ আছে, অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে; কিন্তু লক্ষ্য করিও, তাহারা সর্বাবস্থায় নিজেদের দেহপীড়নই করে, প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে না। কোন ধর্মোন্মাদ হিন্দু-চিতায় স্বীয় দেহ দগ্ধ করিলেও ধর্মগত অপরাধের প্রতিবিধান করিবার জন্য কখনও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে না; ইহাকে যদি তাহার দুর্বলতা বলো, সে দোষ তাহার ধর্মের নয়, যেমন ডাইনী পোড়ানোর দোষ খ্রীষ্টধর্মের উপর দেওয়া যায় না।

অতএব হিন্দুর পক্ষে সমগ্র ধর্মজগৎ নানারুচিবিশিষ্ট নরনারীর নানা অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য দিয়া সেই এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কিছু নয়।

প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্য-স্বরূপ-দেবত্ব বিকশিত করে, এবং সেই এক চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা। তবে এত পরস্পরবিরোধী ভাব কেন? হিন্দু বলেন-আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের উপযোগী হইবার জন্য এক সত্যই এরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে।

একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের মধ্য দিয়া আসিতেছে। সকলের উপযোগী হইবে বলিয়া এই সামান্য বিভিন্নতা প্রয়োজন। কিন্তু সব কিছুরই অন্তস্তলে সেই এক সত্য বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণাবতারে ভগবান্ বলিয়াছেন : সূত্র যেমন মণিগণের মধ্যে, আমিও সেইরূপ সকল ধর্মের মধ্যে অনুস্যূত। যাহা কিছু অতিশয় পবিত্র ও প্রভাবশালী,

মানবজাতির উন্নতিকারক ও পাবনকারী, জানিবে-সেখানে আমি আছি।১ এই শিক্ষার ফল কি? আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, সমুদয় সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে এরূপ ভাব কেহ দেখাইতে পারিবে না যে, একমাত্র হিন্দুই মুক্তির অধিকারী, আর কেহ নয়। ব্যাস বলিতেছেন, 'আমাদের জাতি ও ধর্মমতের সীমানার বাহিরেও আমরা সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই।'

আর একটি কথা। কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন, সর্বতোভাবে ঈশ্বরপরায়ণ হিন্দুগণ কিরূপে অজ্ঞেয়বাদী বৌদ্ধ ও নিরীশ্বরবাদী জৈনদিগের মত বিশ্বাস করিতে পারেন? বৌদ্ধ ও জৈনরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন না বটে, কিন্তু সকল ধর্মের সেই মহান্ কেন্দ্রীয় তত্ত্ব- মানুষের ভিতর দেবত্ব বিকশিত করার দিকেই তাঁহাদের ধর্মের

১ তুলনীয় গীতা; ৭। ৭, ১০। ৪১

সকল শক্তি নিয়োজিত হয়। তাঁহারা 'জগৎপিতা'-কে দেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রকে (আদর্শ মানবকে) দেখিয়াছেন, এবং যে পুত্রকে দেখিয়াছে, সে পিতাকেও দেখিয়াছে।১

ভ্রাতৃগণ, ইহাই হিন্দুদের ধর্মবিষয়ক ধারণাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। হিন্দু তাহার সব পরিকল্পনা হয়তো কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। কিন্তু যদি কখনও একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তাহা কখনও কোন দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবে না; যে অসীম ভগবানের বিষয় ঐ ধর্মে প্রচারিত হইবে, ঐ ধর্মকে তাহারই মতো অসীম হইতে হইবে; সেই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত খ্রীষ্টভক্ত, সাধু অসাধু-সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে; সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইবে না, পরন্তু সকল ধর্মের সমষ্টিস্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির সীমাহীন অবকাশ থাকিবে; স্বীয় উদারতাবশতঃ সেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে, পশুতুল্য অতি হীন বর্বর মানুষ হইতে শুরু করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণরাশির জন্য যাঁহারা সমগ্র মানবজাতির ঊর্ধ্বে স্থান পাইয়াছেন ,সমাজ যাঁহাদিগকে সাধারণ মানুষ বলিতে সাহস না করিয়া সশ্রদ্ধ সভয় দৃষ্টিতে দেখেন-সেই-সকল শ্রেষ্ঠ

মানব পর্যন্ত সকলকেই স্বীয় অঙ্কে স্থান দিবে। সেই ধর্মের নীতিতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না; উহাতে প্রত্যেক নরনানীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হইবে এবং উহার সমগ্র শক্তি মনুষ্যজাতিকে দেব-স্বভাব উপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকিবে।

এইরূপ ধর্ম উপস্থাপিত কর, সকল জাতিই তোমার অনুবর্তী হইবে। অশোকের ধর্মসভা কেবল বৌদ্ধধর্মের জন্য হইয়াছিল। আকবরের ধর্মসভা ঐ উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হইলেও উহা বৈঠকী আলোচনা মাত্র। প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর আছেন-সমগ্র জগতে এ-কথা ঘোষণা করিবার ভার আমেরিকার জন্যই সংরক্ষিত ছিল।

যিনি হিন্দুর ব্রহ্ম,পারসীকদের অহুর-মজদা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ইহুদীদের জিহোবা, খ্রীষ্টানদের 'স্বর্গস্থ পিতা' , তিনি তোমাদের এই মহৎ ভাব কার্যে পরিণত করিবার শক্তি প্রদান করুন। পূর্ব গগনে নক্ষত্র উঠিয়াছিল-কখন উজ্জ্বল, কখন অস্পষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে উহা পশ্চিম গগনের দিকে চলিতে লাগিল। ক্রমে সমগ্র জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্বাপেক্ষা সহস্রগুণ উজ্জ্বল হইয়া পুনরায় পূর্বগগনে স্যানপোর২ সীমান্তে উহা উদিত হইতেছে।

স্বাধীনতার মাতৃভূমি কলম্বিয়া,৩ তুমি কখনও প্রতিবেশীর শোণিতে নিজ হস্ত রঞ্জিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্বস্ব অপহরণ-রূপ ধনশালী হইবার সহজ পন্থা আবিষ্কার কর নাই। সভ্যতার পুরোভাগে সমন্বয়ের পতাকা বহন করিয়া বীরদর্পে অগ্রসর হইবার ভার তাই তোমারই উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

৫. খ্রীষ্টানগণ ভারতের জন্য কি করিতে পারেন?

[২০শে সেপ্টম্বর, দশম দিবসের অধিবেশনে প্রদত্ত]

খ্রীষ্টানদের সর্বদাই স্পষ্ট কথা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত; আমার বোধ হয়, যদি আমি তোমাদের একটু সমালোচনা করি, তাহাতে কিছু মনে করিবে না। তোমরা খ্রীষ্টানেরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাদের নিকট ধর্মপ্রচারক পাঠাইতে খুব উদ্গ্রীব, কিন্তু বলো দেখি, অনাহার ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে তাহাদের দেহগুলি বাঁচাইবার জন্য কোন চেষ্টা কর না কেন? ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র সহস্র মানুষ ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টানেরা কিছুই কর নাই! তোমরা ভারতে সর্বত্র গির্জা নির্মাণ কর, কিন্তু প্রাচ্যে সর্বাধিক অভাব-ধর্ম নয়, ধর্ম তাহাদের প্রচুর পরিমাণে আছে। ভারতের কোটি কোটি আর্ত নরনারী শুষ্ককণ্ঠে কেবল দুটি অন্ন চাহিতেছে। তাহারা অন্ন চাহিতেছে, আর আমরা তাহাদিগকে প্রস্তরখন্ড দিতেছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো, তাহাকে অপমান করা। ভারতে যদি কেহ পারিশ্রমিক লইয়া ধর্মপ্রচার করে, তবে তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়, সকলে তাহাকে ঘৃণা করে। আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীর জন্য তোমাদের নিকট সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিলাম, খ্রীষ্টান দেশে খ্রীষ্টানদের নিকট হইতে অখ্রীষ্টানদের জন্য সাহায্য লাভ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছি।

[ইহার পর সনাতনধর্মের পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া তিনি বক্তৃতা শেষ করিলেন।]

[২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার দ্বাদশ দিবসের অধিবেশনে হিন্দুধর্মের বিষয়েই অধিক বলা হইয়াছিল। সেই দিবস স্বামী বিবেকানন্দ সনাতনধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। নানামতাবলম্বী নরনারীগণ তাঁহাকে অতিশয় আগ্রহ সহকারে শত শত ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন

করিয়া ছিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ অতি নিপুণতার সহিত সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাদের কৌতুহল চরিতার্থ করেন। সেদিন তিনি তাঁহাদের হৃদয়ে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এতদুর কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে সনাতনধর্ম সম্বন্ধে আর একদিবস অন্যত্র বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন, তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হন।]

৬. বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ

২৬শে সেপ্টেম্বর, ষোড়শ দিবসের অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা] আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন যে, আমি বৌদ্ধ নই, তথাপি একভাবে আমি বৌদ্ধ। চীন, জাপান, ও সিংহল সেই মহান্ গুরু বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে, কিন্তু ভারত তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করে। আপনারা এইমাত্র শুনিলেন যে, আমি বৌদ্ধধর্মের সমালোচনা করিতে উঠিতেছি; কিন্তু আমি চাই তাহা পূর্বোক্ত অর্থেই গ্রহণ করিবেন; যাঁহাকে আমি ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করি, তাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা আমার অভিপ্রায়ই নয়। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ইহুদীধর্মের সহিত খ্রীষ্টানধর্মের যে সম্বন্ধ, হিন্দুধর্ম অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্মের সহিত বর্তমানকালের বৌদ্ধধর্মের প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ। যীশুখ্রীষ্ট ইহুদী ছিলেন ও শাক্যমুনি হিন্দু ছিলেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, ইহুদীগণ যীশুকে পরিত্যাগ করিলেন এবং এমন কি ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিলেন, হিন্দুগণ কিন্তু শাক্যমুনিকে ঈশ্বরের উচ্চাসন দিয়া এখনও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধধর্মের সহিত বুদ্ধদেবের প্রকৃত শিক্ষার যে পার্থক্য আমরা-হিন্দুরা দেখাইতে চাই, তাহা প্রধানতঃ এই : শাক্যমুনি নতুন কিছু প্রচার করিতে আসেন নাই। যীশুর মতো তিনিও 'পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন নাই।' প্রভেদ এইটুকু যে, যীশুর ক্ষেত্রে প্রাচীনগণ অর্থাৎ ইহুদীরাই তাঁহাকে বুঝিতে পারেন নাই, আর বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে তাঁহার শিষ্যগণই তাঁহার শিক্ষার মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। ইহুদীরা যেমন (যীশুর মধ্যে) ওল্ড টেস্টামেন্টের পূর্ণ পরিণতি বুঝিতে পারেন নাই, বৌদ্ধগণও তেমনি(বুদ্ধের মধ্যে) হিন্দুধর্মের সত্যগুলির পূর্ণ পরিণতি বুঝিতে পারেন নাই।

আমি পুনর্বার বলিতেছি : শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নয়।; তিনিও ছিলেন হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত-ন্যায়সম্মত বিকাশ।

হিন্দুধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত-কর্মকান্ড ও জ্ঞানকান্ড; সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানকান্ডের আলোচনা করিয়া থাকেন; ইহাতে জাতিভেদ নাই। ভারতে উচ্চতম বর্ণের মানুষও

সন্ন্যাসী হইতে পারে, নিম্নতম বর্ণের মানুষও সন্ন্যাসী হইতে পারে, তখন উভয় জাতিই সমান। ধর্মে জাতিভেদ নাই; জাতিভেদ কেবল সামাজিক ব্যবস্থা। শাক্যমুনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয় এত উদার ছিল যে, লুকানো বেদের মধ্য হইতে সত্যকে বাহির করিয়া তিনি সেগুলি সমগ্র পৃথিবীর লোকের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন-ইহাই তাঁহার গৌরব। পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তিনিই প্রথম প্রবর্তক; শুধু তাই নয়, ধর্মান্তরিত-করণের ভাব তাঁহারই মনে প্রথম উদিত হইয়াছে।

সকলের প্রতি-বিশেষতঃ অজ্ঞান ও দরিদ্রগণের প্রতি অদ্ভুত সহানুভূতিতেই তাঁহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার কয়েকজন শিষ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে সময়ে বুদ্ধ শিক্ষা দিতেছিলেন, সে সময়ে সংস্কৃত আর ভারতের কথ্য ভাষা ছিল না। ইহা সেসময়ে পণ্ডিতদের পুস্তকেই দেখা যাইত। বুদ্ধদেবের কোন কোন ব্রাহ্মণ শিষ্য তাঁহার উপদেশগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে চান, তিনি কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, 'আমি দরিদ্রের জন্য-জনসাধারণের জন্য আসিয়াছি, আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথা বলিব।' আজ পর্যন্ত তাঁহার অধিকাংশ উপদেশ সেই সময়কার চলিত ভাষাতেই লিপিবদ্ধ।

দর্শনশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যা যত উচ্চ আসনই গ্রহণ করুক, যতদিন জগতে মৃত্যু বলিয়া ব্যাপারটি থাকিবে, যতদিন মানবহৃদয়ে দুর্বলতা বলিয়া কিছু থাকিবে, যতদিন চরম দুর্বলতায় মানুষের মর্মস্থল হইতে রোদনধ্বনি উত্থিত হইবে, ততদিন ঈশ্বরে বিশ্বাসও থাকিবে। দর্শনশাস্ত্রের দিক দিয়া সেই লোকগুরু বুদ্ধের শিষ্যগণ বেদরূপ সনাতন শৈলের অভিমুখে সবেগে পতিত হইলেন কিন্তু তাহাকে চূর্ণ করিতে পারিলেন না। অপর দিকে যে সনাতন ঈশ্বরকে নরনারী সকলে সাদরে ধরিয়া থাকে, তাঁহাকে সমগ্র জাতির নিকট হইতে অপসৃত করিলেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হইয়াছিল। বর্তমানকালে বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতে এমন একজনও নাই, যিনি নিজেকে বৌদ্ধ বলেন। কিন্তু এইসঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মও কোন কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সেই

সমাজসংস্কারের জন্য আগ্রহ, সকলের প্রতি সেই অপূর্ব সহানুভূতি ও দয়া, সর্বসাধারণের ভিতর বৌদ্ধধর্ম যে ব্যাপক পরিবর্তনের ভাব প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, তাহা ভারতীয় সমাজকে এতদূর উন্নত ও মহান্ করিয়াছিল যে, তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিককে বলিতে হইয়াছে : কোন হিন্দু মিথ্যা বলে বা কোন হিন্দুনারী অসতী-এ-কথা শোনা যায় না।

সভামঞ্চে যে-সকল বৌদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বক্তা বলিতে লাগিলেন : হে বৌদ্ধগণ! বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচিতে পারে না; হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বাঁচিতে পারে না। অতএব উপলব্ধি করুন-আমাদের এই বিযুক্ত বিচ্ছিন্নভাব স্পষ্টই দেখাইয়া দিতেছে যে, ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া বৌদ্ধেরা দাঁড়াইতে পারেন না এবং ব্রাহ্মণও বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে দাঁড়াইতে পারে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। এইজন্যই আজ ভারতবর্ষ ত্রিশকোটি ভিক্ষুকের বাসভূমি হইয়াছে, এইজন্যই ভারতবাসী সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজেতাদের দাসত্ব করিতেছে। অতএব আসুন, আমরা ব্রাহ্মণের অপূর্ব ধীশক্তির সহিত লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান্ আত্মা এবং অসাধারণ লোক-কল্যাণশক্তি যুক্ত করিয়া দিই।

৮. পরিশিষ্ট

চিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশন-কালে মহাসভার বৈজ্ঞানিক বিভাগে স্বামীজী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন :

(১) শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম এবং বেদান্তদর্শন -শুক্রুবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, পূর্বাহ্ন ১০।। টায়।

(২) ভারতের বর্তমান ধর্মসমূহ -শুক্রুবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, অপরাহ্ন অধিবেশন।

(৩) পূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির বিষয়-সম্বন্ধে -শনিবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর।

(৪) হিন্দুধর্মের সারাংশ -সোমবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর। ‘ The Chicago Daily Inter-Ocean’ সংবাদ ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রথম বক্তৃতা-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন :

ধর্মমহাসভার বৈজ্ঞানিক বিভাগে গতকাল পূর্বাহ্নে স্বামী বিবেকানন্দ ‘শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম’ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ৩নং হল লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; শ্রোতৃবিন্দ শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং সন্ন্যাসিপ্রবর অপূর্ব দক্ষতার সহিত প্রাঞ্জলভাবে ঐগুলির উত্তর দেন। অধিবেশনের শেষে আগ্রহান্বিত জিজ্ঞাসুরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ন এবং তাঁহার ধর্ম-সম্বন্ধে কোথাও একটি ছোট সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, পরিকল্পনাটির কথা ইতঃপূর্বেই তাঁহার মনে উঠিয়াছে।

৯. প্রাচ্য নারী

[চিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশন-কালে মহাসভার 'মহিলা পরিচালক বোর্ড' –এর অধ্যক্ষা মিসেস পটার পামার কর্তৃক আয়োজিত এক বিশেষ সভার চিকাগোর জ্যাক্ সন স্ট্রীটে মহিলা সদনে স্বামীজী এই বক্তৃতা দেন। 'Chicago Daily Inter-Ocean' সংবাদপত্রে ২৩শে সেপ্টম্বর(১৮৯৩) নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হয়।]

স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিশেষ সভায় প্রাচ্যদেশের নারীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন : কোন জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি নারীদের প্রতি তাহার মনোভাব। প্রাচীন গ্রীসে স্ত্রী-পুরুষের মর্যাদায় কোন পার্থক্য ছিল না; পূর্ণ সমতার ভাব বিরাজিত ছিল। কোন হিন্দুও বিবাহিত না হইলে পুরোহিত হইতে পারে না; ভাবটা এই যে, অবিবাহিত ব্যক্তি অর্ধাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ। পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই পূর্ণ নারীত্ব। আধুনিক হিন্দুনারীর জীবনের প্রধান ভাব তাহার সতীত্ব। পত্নী যেন বৃত্তের কেন্দ্র-ঐ কেন্দ্রর স্থিরত্ব নির্ভর করে তাহার সতীত্বের উপর। এই আদর্শের চরম অবস্থায় হিন্দু বিধবারা সহমরণে দগ্ধ হইতেন। সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীদের অপেক্ষা হিন্দুনারীগণ বেশী ধর্মশীলা ও আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্না। যদি আমরা চরিত্রের ঐ সকল সদ্‌গুণ রক্ষা করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নারীদের বুদ্ধিবৃত্তির পুষ্টিসাধন করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ হিন্দুনারী জগতের আদর্শস্থানীয়া হইবেন।

১০. ধর্মীয় ঐর্কের মহাসম্মেলন

[২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, ‘ Chicago Sunday Herald’ পত্রিকার প্রকাশিত স্বামীজীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী।]

এই ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের ভ্রাতৃত্বই বহু-আকাঙ্খিত উদ্দেশ্য। এই ভ্রাতৃত্ব একটি স্বাভাবিক অবস্থা, কারণ আমরা সকলে একই ঈশ্বরের সন্তান-এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। আবার এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহার ঈশ্বরের অস্তিত্ব অর্থাৎ ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর স্বীকার করে না। যদি আমরা এই-সকল সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া বাহিরে রাখিতে চাই, তাহা হইলে অবশ্য আমাদের ভ্রাতৃত্ব সর্বজনীন হইবে না; যদি তাহা না চাই, তাহা হইলে সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আমাদের মিলনভূমি প্রশস্ত করিতেই হইবে। এই ধর্মমহাসভায় আরও বলা হইয়াছে-মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা আমাদের কর্তব্য, কারণ প্রত্যেক অসৎ ও হীন কার্যেরই প্রতিক্রিয়া আছে। আমার মনে হয়, এটি দোকানদারির ভাব : আমরাই প্রথমে, তারপর আমাদের ভাই-এরা। আমি মনে করি, ঈশ্বরের সর্বজনীন পিতৃত্বে আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, ভাইকে আমাদের ভালবাসিতেই হইবে, কারণ প্রত্যেক ধর্ম ও প্রত্যেক মত মানুষের দিব্যভাব স্বীকার করে; কাহারও অনিষ্ট করিও না, তাহা হইলে তাহার অন্তর্নিহিত দিব্যভাবকে ক্ষুন্ন করা হইবে না।

১১. ভগবৎপ্রেম

[২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, 'Chicago Herald' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজীর একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী]

লাফলিন ও মনরো স্ট্রীটে তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চের বক্তৃতা-গৃহে সমবেত শ্রোতৃমন্ডলী গতকল্য প্রাতে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল ভগবৎপ্রেম; আলোচনা বাগ্মিতাপূর্ণ ও অপূর্ব হইয়াছিল।

তিনি বলেন : ঈশ্বর পৃথিবীর সর্বত্র পূজিত হন, কিন্তু বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন উপায়ে। মহান্ ও সুন্দর ঈশ্বরকে উপাসনা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত। সকলেই ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই মানুষকে দান, দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সৎকার্যে প্রণোদিত করে। সকলেই ঈশ্বরকে ভালবাসে, কারণ তিনি প্রেমস্বরূপ।

বক্তা চিকাগোতে আসা অবধি মানুষের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন-আরও দৃঢ়তর বন্ধন মানুষকে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, কারণ সকলেই ঈশ্বরপ্রেম হইতে সঞ্জাত। মানুষের ভ্রাতৃত্ব ঈশ্বরের পিতৃত্বেরই যুক্তিগত সিদ্ধান্ত। বক্তা বলেন :

তিনি ভারতের বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, পর্বতগুহায় রাত্রি কাটাইয়াছেন, সমগ্র প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছেন যে, স্বাভাবিক নিয়মের ঊর্দ্ধে এমন কিছু আছে, যাহা মানুষকে অসত্য বা অন্যায় হইতে রক্ষা করে। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহা ঈশ্বরপ্রেম। ঈশ্বর যদি যীশু, মহম্মদ ও বৈদিক ঋষিগণের সহিত কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঈশ্বরেরই অন্যতম সন্তান-তাঁহার সহিতও তিনি কেন কথা বলেন না?

স্বামী আরও বলিলেন : সত্যই তিনি আমার সহিত এবং তাঁহার সকল সন্তানের সহিত কথা বলেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের চতুর্দিকে দেখি এবং তাঁহার প্রেমের সীমাহীনতা দ্বারা নিরন্তর প্রভাবিত হই এবং সেই প্রেম হইতে আমাদের মঙ্গল ও শুভকর্মের প্রেরণা লাভ করি।